কৃষি বান্ধব বাজেট: দেশীয় বীজের সম্প্রসারণে বরাদ্দ চাই

বিদেশী বীজের আগ্রাসন থেকে কৃষিকে বাঁচাতে হবে

১. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি ও সাম্প্রতিক সংকট

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩ অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থ বছরে দেশের মোট জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ছিল ১৮.৭০ শতাংশ। দেশের শ্রমশক্তির ৪৭.৫ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। উক্ত অর্থ বছরে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে আয় ছিল মোট রপ্তানি আয়ের ১১.৯ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থ বছরে দেশের মোট জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ছিল ১৯.৪১ শতাংশ, ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ছিল ২০.৪৮ শতাংশ। উক্ত অর্থ বছরে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে আয় ছিল মোট রপ্তানি আয়ের ৫.৫৯ শতাংশ। লক্ষ্য করলে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, জিডিপিতে কৃষির ভূমিকা কমে যাচ্ছে। তার মানে আমরা দিনের পর দিন খাদ্যপণ্য আমদানির দিকে ঝুঁকে পড়ছি, এর ফলে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি হয়ে পড়ছে পরনির্ভরশীল ও বিপদাপন্ন।

হাইব্রিড-জিএমও প্রভৃতি নানা নামে দেশের কৃষিতে বিদেশি বীজের আগ্রাসন চলছে। দেশের বীজ দিয়েই যেখানে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব, সেখানে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর দূরভিসন্ধির কারণে ধীরে ধীরে আমাদের কৃষি হয়ে পড়ছে পরনির্ভরশীল, কয়েকটি কোম্পানির কাছে হয়ে পড়ছে জিম্মি। আমাদের দেশের কৃষির জন্য উপযুক্ত বিদেশি বীজ নিতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু সেই বীজের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে কৃষকের। পর্যাপ্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া অপ্রয়োজনীয় ভিনদেশি বীজের অনুপ্রবেশ আমাদের কৃষির জন্য আত্মঘাতি।

২. স্বনির্ভর, কৃষি ও কৃষক বান্ধব বাজেট চাই

আমাদের কৃষি ও কৃষকের সমস্যা অনেক, সুতরাং সুপারিশও হতে পারে অনেক। এখানে বীজের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। কারণ আমরা মনে করি, এই খাতে সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে এখনই কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়া হলে পুরো কৃষি ব্যবস্থা চরম হুমকির মধ্যে পড়ে যাবে।

২.১ বিএডিসি ও কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে

২.১.১ বিএডিসিকে অকার্যকর করে ফেলতে সরকারি নীতিমালা!

বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে বিএডিসি'র ভূমিকা অপরিসীম। কৃষকের দোরগোড়ায় উন্নত কৃষি বীজ ও প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, নানাভাবে, পরিকল্পিতভাবে বিএডিসিকে অকার্যকর করে ফেলা হচ্ছে। অনেকে অভিযোগ করেন, বিএডিসিকে অকার্যকর করা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। ১৯৯৩ সালে প্রণীত জাতীয় বীজ নীতিমালা তার শক্তিশালী উদাহরণ। এই নীতিমালার এক পর্যায়ে বলা হয়েছে, *যে সকল বীজ বেসরকারী খাতে উৎপাদিত হচ্ছে সেগুলোর উৎপাদন থেকে বিএডিসি ধীরে ধীরে সরে আসবে* (অনুচ্ছেদ ১১.২.২(খ))। এর পরের অনুচ্ছেদেই আছে, *বেসরকারী খাতে বীজ শিল্প উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বীজ উইং কারিগরী সহযোগিতা এবং অন্যান্য সহায়তা/ সেবা প্রদান করবে।* ১১.২.৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, *উপজেলা পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ বিক্রয়কেন্দ্রগুলো ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে বেসরকারী বীজ ডিলারগণকে সেস্থলে নিয়োজিত করা হবে।*

আমরা মনে করি, দেশের কৃষিতে অসামান্য অবদান রাখা এই সংস্থাটিকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। সেটা প্রয়োজন আমাদের কৃষির স্বার্থেই। বিএডিসিকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় নীতিগত ও কাঠামোগত সংস্কারের জন্য এই বছরের বাজেটে বরাদ্দ রাখা আমাদের অন্যতম দাবি।

২.১.২ খরচ কমানোর নামে শ্রমিক ছাটাই বন্ধ করতে হবে

খরচ কমানের নাম করে বিভিন্ন সময় বিএডিসিকে বিভিন্নভাবে আঘাত করা হয়েছে। বিএডিসি'র প্রাণ হলো এর শ্রমিকরা, যারা রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট করে কাজ করে উৎপাদন চালিয়ে যান। ২০০২ সালের অক্টোবরে ১৬০৪ নিয়মিত শ্রমিককে ছাটাই করা

বীজ ব্যবস্থাপনায় সরকারি-বেসরকারি খাত

সব ধরনের ফসল মিলে দেশে বীজের চাহিদা বছরে ১১ লাখ ৫০ হাজার টন। এর মধ্যে আলুবীজের চাহিদা প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টন। ধানবীজের চাহিদা সাড়ে তিন লাখ টনের মতো। বাকি আড়াই লাখ টন অন্যান্য খাদ্যশস্য, বিশেষ করে সবজি, মসলা ও ভুট্টা। সরকারি ও বেসরকারি খাতের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বীজ সরবরাহ হচ্ছে মাত্র ছয় লাখ ১০ হাজার টন, যা চাহিদার ৫৩ শতাংশ। সরকারি প্রতিষ্ঠান বিএডিসি বীজ সরবরাহ করছে বছরে মাত্র দেড় লাখ টন। বাকি বীজ সরবরাহ করছে বেসরকারি খাত। হাইব্রিড বীজের ৯০ শতাংশের বেশি সরবরাহ করছে খাতটি। এছাড়া এ খাতের মাধ্যমে প্রায় শতভাগ সবজি ও ভুট্টা বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে (বণিক বার্তা)। একটা সময় ছিল যখন দেশের মোট বীজ সরবরাহ ব্যবস্থার প্রায় পুরোটাই করতো সরকারি খাত, ধীরে ধীরে সরকারি খাত এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। ২০০৫-০৬ সালে মোট বাজারজাতকৃত বীজের ৮৮.৫% ছিল সরকারি খাতের, ১১.৫% ছিল বেসরকারি খাতের। দুই বছরের মাথায়, ২০০৭-০৮ সালে দেখা যায় সরকারি খাতের অবদান কমে ৮৩% হয়েছে এবং বেসরকারি খাতের অবদান বেড়ে দাঁড়ায় ১৭%-এ (ক্যাটালিস্ট)। আর বর্তমান অবস্থার চিত্র উল্লেখ করা হয়েছে আগেই । বেসরকারি খাতে সনদপ্রাপ্ত ১৭৬টি কোম্পানি দেশে বীজ সরবরাহ করছে। প্রায় ১৭ হাজার ডিলারের মাধ্যমে তারা বীজ সরবরাহ করছে। এর বাইরেও ১০ হাজারের মতো ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী রয়েছেন। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনে (বিএডিসি) নিবন্ধিত সরাসরি বীজ ডিলার প্রায় আট হাজার। সব মিলিয়ে প্রায় ১১ হাজার ৬০০ ডিলারের মাধ্যমে সরকারি বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে। বীজের সরবরাহ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ বেসরকারি খাতে গেলে এ খাতে অনিশ্চয়তা বাড়ে। যেহেতু কোম্পানিগুলোর লক্ষ্য মুনাফা, ফলে বীজের দাম বাড়ে, কৃষকের উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়। বিএডিসি বা সরকারের কাছে সেই নিয়ন্ত্রণ থাকলে সেটা কৃষির জন্য লাভজনক।

হয় খরচ কমানোর নাম করে। এদের প্রায় সবাইকে অনিয়মিত শ্রমিক হিসেবে কাজ করানো হচ্ছে এখনও। নিয়মিত শ্রমিক হিসেবে এদের ১০ মাসের বর্ধিত বকেয়া বেতন-ভাতাও এখনও পরিশোধ করা হয়নি। বর্তমানে বিএডিসি'র কোনও নিয়মিত শ্রমিক নেই, অনিয়মিত শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো হয়। তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী বিএডিসিকে 'লাভজনক' একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতেই এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন (যুগান্তর ২০০২)। মূলত বিশ্ব ব্যাংক-আইএমএফ'র চাপে, কৃষি খাতে ভর্তুকি কমানোর কৌশল হিসেবেই নিজ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র লংঘন করে এই শ্রমিক ছাটাই করা হয়েছিল। ১৯৯০ সালে জারিকৃত কৃষি ফার্ম শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালার ১০ নং অনুচ্ছেদে শ্রমিক অব্যহতি দেওয়ার যেসব কারণ বা নিয়মের কথা বলা হয়েছে তার কোথাও বাধ্যতামূলক অবসরের কথা বলা হয়নি। অথচ ১৬০৪ জন শ্রমিককে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হলো, তাও আবার তাদের বকেয়া পরিশোধ না করেই।

এই অনিয়মিত শ্রমিকরা নানা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। যেমন, ২০০১ সালের ১৮ জানুয়ারি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী শ্রমিদের বেতন তাদের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করার কথা থাকলেও অনেক জায়গায় সেটা করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ সব অভিযোগ জানিয়ে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বারবার বিভিন্ন জায়গায় আবেদন করলেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না। শ্রমিকদের অভিযোগ, এই অনিয়মের মূল কারণ, বিএডিসিকে অকার্যকর করে ফেলার চক্রান্ত। আমরা মনে করি বিএডিসিকে শক্তিশালী করতে শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে যথাযথ বরাদ্দ থাকা উচিৎ এবারের বাজেটে।

২.১.৩ বাজেট হওয়া উচিৎ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে

বর্তমানে বিএডিসি তার চাহিদা মতো বাজেট বরাদ্দ পাচ্ছে না, নিয়োগ দিতে পারছে না প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল। আমরা একটি জেলার উদাহরণ এখানে দিতে পারি। কক্সবাজার জেলা বিএডিসি'র গত তিন বছরের জন্য মোট বাজেট চাহিদা ছিল ২ কোটি ৯০ লাখ টাকা, এর বিপরীতে বরাদ্দ পাওয়া গেছে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা। অর্থাৎ চাহিদার প্রায় অর্ধেক বরাদ্দ পাওয়া গেছে (৫৮.৬২%)। এই জেলায় ৬ জন কমকর্তার জায়গায় কর্মরত আছেন ৪ জন এবং ১১৫ জন শ্রমিকের জায়গায় কাজ করছেন মাত্র ৩৮ জন, প্রায় এক তৃতীয়াংশ (৩৩.০৪%)। আগামী বাজেটে এ সমস্যাগুলোকে বিবেচনা করা হবে বলে আমরা আশা করি।

২.১.৪ কমে যাচ্ছে বিএডিসির বিতরণ: উৎপাদন ও বিতরণ বাড়াতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রয়োজন

নানা কারণে, নানা জটিলতায় বিএডিসি'র বীজ বিতরণ দিনের পর দিন কমছে। বিএডিসি ২০১০-১১ অর্থবছরে এক লাখ ৫৬ হাজার ৪৭৫ টন, ২০১১-১২ অর্থবছরে এক লাখ ৪৪ হাজার ২০০ টন এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা আরও কমে গিয়ে এক লাখ ১২ হাজার ৭৫২ টন বীজ বিতরণ করে। নিচের গ্রাফে এটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, বীজ সরবরাহ প্রতি বছরই কমছে। (তথ্য সুত্র দৈনিক বর্তমান)

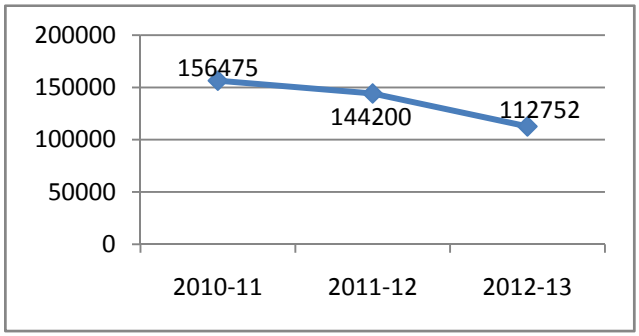

দেশের মোট বীজ সরবরাহের ক্ষেত্রে বিএডিসির অবদানও তাই দিনের পর দিন কমছে। জানা গেছে, দেশের মোট বীজ সরবরাহের মাত্র ২৪.৫৯% করে থাকে বিএডিসি, আর বাকিটুকু করে বেসরকারি বিভিন্ন কোম্পানি।

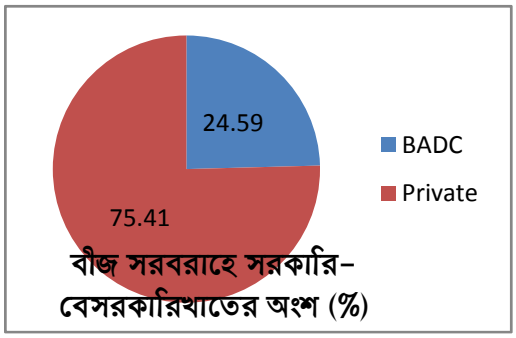

উন্নত মানের বীজ উৎপাদনে বিএডিসি'র সক্ষমতা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও স্বীকৃত। এরপরেও উন্নত মানের বীজ উৎপাদন, আমদানি ও সরবরাহের ক্ষেত্রে বিএডিসিকে প্রধান্য না দিয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য প্রদান কোনভাবেই কৃষি বা কৃষকের স্বার্থের সপক্ষে হতে পারে না। আগামী বাজেটে আমরা বিএডিসিকে কার্যকর করার উদ্যোগ দেখতে চাই। এক বছরের মধ্যে আমূল সবকিছু পাল্টে ফেলা যাবে না, কিন্তু কিছু উদ্যোগ তো অবশ্যই নেওয়া যেতে পারে। যথাযথ জনবল নিয়োগ, বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বিএডিসির সক্ষমতা বাড়ানো নিঃসন্দেহে হবে কৃষি ও কৃষকের জন্য আশির্বাদ। বেসরকারি পর্যায়ে বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাকে মনিটরিং করার ক্ষেত্রেও বিএডিসি'র কর্তৃত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২.২ দেশীয় বীজের সম্প্রসারণ এবং কৃষকের নিরাপত্তার চাই

২.২.১ বিদেশি বীজের আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে

উৎপাদনের বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের কৃষকেরা বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন, পাশাপাশি তারা নিজেরা বিভিন্ন কলাকৌশল উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ করে চলছেন। উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়াসে আমাদের সহজ-সরল কৃষকেরা অনেক বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর প্রযুক্তি বা উপায়ও গ্রহণ ও প্রয়োগ করছেন। ফলে আমাদের কৃষি পড়ছে নানাবিধ হুমকির মুখে। আমাদের কৃষি বৈচিত্র্য পড়েছে ঝুঁকিতে। বিভিন্ন হাইব্রিড ও জিএমও বীজ ব্যবহার এমনই একটি ঝুঁকির নাম।

বাংলাদেশে হাইব্রিড বীজ প্রবেশের ইতিহাস সত্যিকার অর্থেই করুণ। ঝলক ধানের বিপর্যয় সহ আরও বেশ কিছু দুঃখজনক উদহারণও পাওয়া যায় হাইব্রিড থেকে। হাইব্রিড বীজ ব্যবহারের ফলে উৎপাদন কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাড়তে পারে। কিন্তু হাইব্রিড বীজ চাষ করতে হলে তার সংশ্লিষ্ট সার, সেচ , কীটনাশক ব্যবহার হতে হবে একেবারে পরিমাণমতো এবং নির্দিষ্ট নির্দেশনামতো। নির্দেশনার হেরফের হলেই ঘটে বিপত্তি। বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় কৃষকদের পক্ষে এভাবে অংক কষে চাষ করা কঠিনই বৈকি। তাছাড়া হাইব্রিড চাষ ব্যয়বহুল, এতে সার, সেচ, কীটনাশক লাগে বেশি। ফলে কৃষকের খরচ হয় বেশি এবং ঝুঁকিও বাড়ে। হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করলে কৃষকরা বীজ কোম্পানির কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে, কারণ সেই বীজ কোম্পানির কাছ থেকে কিনতে হয়। কোম্পানি বীজের দাম বাড়ালে কৃষকের কিছুই করার থাকে না। হাইব্রিড বীজ ব্যবহারে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব, তবে তার জন্য সার ও কীটনাশক ব্যবহার হতে যথাযথ, পরিবেশও থাকতে হবে অনুকূলে। ভেজাল বীজের দৌরাত্ম তো আছেই। অথচ ভেজাল বীজ কিনে কৃষক যদি প্রতারিত হয় তবে তার জন্য ক্ষতিপূরণের কোনও ব্যবস্থা এখনও নেই। তাছাড়া যেসব শর্তে এই বীজগুলো আমদানি করা হলো সেগুলো ঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কি-না তারও যথাযথ তদারকি দরকার।

আমরা মনে করি, আগামী বাজেটে বিদেশি বীজ আমদানি নিরুৎসাহিত করে, দেশি বীজ সম্প্রসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন। বিদেশি বীজ, তথা হাইব্রিড বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও তার ফলন ব্যবস্থার উপর কড়া নজরদারি নিশ্চিত করার জন্যও সংশ্লিষ্ট বিভাগুলো শক্তিশালী করার জন্য বরাদ্দ প্রয়োজন।

২.২.২ জিএমও, বিটি বেগুন চাই না

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড অরগানিসম বা জিএমও নিয়ে সারা বিশ্বজুড়েই বিতর্ক চলছে। এই বীজ উৎপাদক কোম্পানি এসব বীজের নিরাপত্তার ব্যাপারে কথা বললেও, নিরপেক্ষ বেশ কিছু গবেষণায় জিএমও বীজের ক্ষতিকর দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। এমনকি জিএমও বীজের অন্যতম উৎপাদনকারী মনসান্তোর গবেষণাতেও এর ক্ষতিকর দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। জিএমও নিয়ে কয়েকটি গবেষণার উদাহরণ:

- ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে দেখা গেছে, জিএম জাতের তুলা চাষের সঙ্গে জড়িত কৃষকদের গায়ে বিভিন্ন চর্মরোগ দেখা দিচ্ছে।
- অন্ধ্র প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কিছু এলাকায় যেখানে এ ধরনের তুলা চাষ হয়, সেখানে পশু-পাখির রোগের প্রকোপ ও মৃত্যুহার বেড়ে গেছে।
- ভারতে বিটি তুলা চাষে কৃষকদের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফলন না হওয়ায় প্রচুর কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ প্রচুর ফলনের লোভ দেখিয়ে তাদের কাছে বীজ বিক্রি করা হয়েছিল এবং তারা অনেক ঋণ করে জমিতে সেই তুলা চাষ করেছিলেন।
- ১৯৯৩ সালে ব্রাজিলের এক ধরনের সয়াবিনের ওপর গবেষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কার কিছু গবেষক। এই সয়াবিনে বাদামের কিছু জিন প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। তারা দেখতে পান, যেসব লোকের বাদামের প্রতি এলার্জি আছে, তারা ওই সয়াবিনের সংস্পর্শে এলে মারাত্মক এলার্জিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন। অর্থাৎ এলার্জির মাত্রা বেড়ে যায়।
- ১৯৯৮ সালে যুক্তরাজ্যের নিউট্রিশন ও টক্সিকোলজি বিজ্ঞানী আপ্রাড পুত্সাই জিএম টমেটোর ওপর একটি গবেষণা চালান। তিনি দেখতে পান, এই টমেটো খাওয়ানো হলে ইঁদুরের ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমে যাচ্ছে এবং সেগুলোয় অস্বাভাবিক কিছু দৈহিক পরিবর্তন হচ্ছে।
- ১৯৯৯ সালে জার্নাল অব মেডিসিন ফুডে ড. মার্ক লেপ্পের একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, ক্যান্সার ও হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে এমন কিছু উপাদানের উপস্থিতি সাধারণ সয়াবিনের তুলনায় জিএম সয়াবিনে অনেক কম।
- জিএম শস্য ও খাদ্যের অন্যতম প্রধান কোম্পানি মনসান্তো। ২০০৪ সালে তাদেরই পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, জিএম ভুট্টা ইঁদুরের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে।
- বিশ্ববিখ্যাত টেলিগ্রাফ পত্রিকায় কিছুদিন আগে দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশে জিএম সয়াবিন চাষের বিপর্যয় নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে লুইস গ্রে বলছেন, সবুজ স্বর্ণ হিসেবে পরিচিত এই সয়াবিন এখন বিষে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেছেন, জিএম সয়াবিন চাষের ফলে আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়েতে এর চাষী ও আশপাশের মানুষ নানা ধরনের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। কয়েকজন এ ধরনের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারাও গেছেন বলে ওই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়।

অথচ আমাদের দেশে সেই জিএমও চলে এসেছে। বিটি বেগুনের চাষের অনুমতি ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। বিটি বেগুন বা জিএমও বীজ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে হয়ত অনেক কথাই বলা যাবে। কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর জানা খুবই জরুরি। ২০০৫ সালে উদ্ভাবন করলেও ভারতীয় বীজ কোম্পানি মাহিকো এখন পর্যন্ত তার নিজের দেশে বিটি বেগুন চাষের অনুমোদন পায়নি কেন? ভারতে এই বেগুনের বীজ বাজারজাতকরণের চেষ্টা চালানো হলে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সরকার বাধ্য হয়ে দেশব্যাপী জাতীয় পরামর্শ সভার আয়োজন করে। হাজার হাজার কৃষক, বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদসহ বিভিন্ন জনের সঙ্গে পরামর্শ করে সরকার সে দেশে এই বেগুনের বাজারজাতকরণ বন্ধ করে দেয়; নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে এখনো। এতই যদি গুণাগুণ সম্পন্ন হয় এই বিটি বেগুন, তাহলে মাহিকো কেন তার দেশের মানুষ আর সরকারকে এর সম্পর্কে বোঝাতে পারল না?

উৎপাদন বাড়ানো, কীটপতঙ্গ দূর করার জন্য পরিবেশ বান্ধব অনেক উপায় আছে, সেগুলোর ব্যাপক প্রচলনের জন্য বাজেট বরাদ্ধ জরুরি। কৃষি জমির অন্যখাতের ব্যবহার বন্ধ করতে পারলে, প্রাকৃতিক উপায়ে কীট-পতঙ্গ দূরীকরণের পদ্ধতি ব্যবহার করে, শস্য বহুমুখিকরণ করে সহজেই আমরা এই সুফল পেতে পারি। বন্ধ করতে হবে বিদেশি বীজের আগ্রাসন। বিদেশি বীজ আমদানি কমানোর লক্ষ্যে দেশি বীজ উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে বরাদ্দ প্রয়োজন।

৩. বীজ ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে

বিদেশি, হাইব্রিড বা বিভিন্ন কোম্পানির বীজ ব্যবহার করে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, যে বিজ্ঞাপন দিয়ে বীজ বিক্রি করা হয়েছিল তার সঙ্গে বাস্তবতার কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না- এরকম খবর আমরা প্রায়ই দেখি। অবাক করা বিষয় হলো, এসব ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক কারও কাছ থেকে যে ক্ষতিপূরণ দাবি করবেন তার কোনও আইনগত ভিত্তি নেই। বাংলাদেশের কোনও আইনে, এমনকি ভেজাল বা নষ্ট বীজ বীজ ব্যবহার করে কৃষক যদি প্রতারিতও হন, তবু এর ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। ২০১১ সালে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে বিশেষ ব্যবস্থায় পরবর্তী মৌসুমের জন্য সার আর বীজ বিনামূল্যে কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা কি যথেষ্ট?

আমরা সরকারি বিভিন্ন নীতি, আইন-বিধি ইত্যাদি পর্যালোচনা করেছি। কৃষকের জন্য ক্ষতিপূরণের বিষয়ে আসলে কোথাও তেমন কোনও স্পষ্ট লেখা নেই।

আমরা বাংলাদেশের বীজ আইন (১৯৭৭ সালে প্রণীত এবং ১৯৯৭ ও ২০০৫ সালে সংশোধিত) পরীক্ষা করে দেখেছি। সেখানেও কৃষকের স্বার্থে সরাসরি কোনও কিছু আমরা পাই না। ঘোষিত মানমত বীজ না পাওয়া গেলে বীজ সরবরাহের সনদ বাতিলের কথা আছে, কিন্তু ঘোষিত মানের বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ না করে নিম্নমানের বীজ সরবরাহ করে কৃষকের ক্ষতি করলে কৃষককে কোনও রকম ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য কোম্পানিকে বাধ্য করার কোনও কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১৯ নং অনুচ্ছেদের ১৯বি নং ধারায় বলা হয়েছে যে, অধ্যাদেশ অমান্য করলে প্রথমবার সর্বোচ্চ ৩০ দিনের কারদণ্ড এবং/অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং পরেরবার সর্বোচ্চ ৯০ দিনের কারাদণ্ড এবং/অথবা ২০ হাজার টাকা জরিমানা।

জাতীয় বীজ নীতির জাত অনুমোদন, নিবন্ধীকরণ শিরোনামের ৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে (৪.৪ উপঅনুচ্ছেদ): *ফসলের কোনও জাত দেশের কৃষির জন্য ক্ষতিকর প্রতীয়মান হলে বা গুরুতর ক্ষতিকর হওয়ার আশংকা থাকলে জাতীয় বীজ বোর্ড সেই জাতের বীজ বিক্রি বন্ধ করে দেবে।* শুধু বিক্রি বন্ধ করা কেন? যারা এঁই বীজ আমদানি করলো তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলেও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাটা তো অন্তত রাখা যায়। আগামী বাজেটে আশা করি কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে এটি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে দেখা হবে।

প্রতিবেশি দেশের অভিজ্ঞতা

আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশটির জেলা পর্যায়ে ভোক্তা ফোরাম আছে, যাদের কাছে কৃষকরা তাদের অভিযোগ করতে পারে। ফোরাম যদি প্রমাণ পায় যে, বীজের কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাহলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করতে পারে। এ ধরনের রায় বা সিদ্ধান্ত জেলা পর্যায়েই দেওয়া সম্ভব। এ ধরনের রায় বা দৃষ্টান্ত ভারতে প্রায়ই ঘটে থাকে। অন্ধ্রা প্রদেশের গুন্টর জেলার একটি উদাহরণ আমরা এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে পারি। ঐ জেলার ভোক্তা ফোরাম কর্নাটক ভিত্তিক কিছু বীজ কোম্পানিকে ২৯.২১ লাখ রুপি জরিমানা করে। জরিমানার ঐ অর্থ তারা ৪৬ জন কৃষককে প্রদানের নির্দেশ প্রদান করে যারা ঐ কোম্পানির কাছ থেকে বীজ কিনে কাঙ্ক্ষিত ফলন লাভে ব্যর্থ হয়েছেন।

অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহ:

বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (৮টি সংগঠন)), লেবার রিসোর্স সেন্টার, কেন্দ্রীয় কৃষক মৈত্রী, বাংলাদেশ কিষাণী সভা, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন (নারী সংগঠন) ও কোস্ট ট্রাস্ট।

সচিবালয়:
কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি: ১৩, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: ০২ ৮১২৫১৮১/৮১৫৪৬৭৩,
ই মেইল: info@coastbd.org, ওয়েব: www.coastbd.org

সহযোগিতায়: অল নেপাল পিজেন্ট ফেডারেশন
অর্থায়নে: ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট

যোগাযোগ:
মো. মজিবুল হক মনির, *মোবাইল: ০১৭১৩৩৬৭৪৩৮, ইমেইল: munir@coastbd.org*
মোস্তফা কামাল আকন্দ, *মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১, ইমেইল: kamal@coastbd.org*

Enabling poor rural people to overcome poverty